بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২০ জানুয়ারি ২০২৩ মোতাবেক ২০ সুলাহ ১৪০২ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করে বলেন,

وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

"আর যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয় তোমরা তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা অনুধাবন করো না। আর আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে কতক ভয়ভীতি, ক্ষুধা, ধনসম্পদ এবং প্রাণ ও ফলফলাদির ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা পরীক্ষা করব, আর ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও। তাদের ওপর যখন কোনো বিপদ আপতিত হয় তখন তারা বলেন, নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌র আর নিশ্চয় আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।" (সূরা আল্ বাকারা: ১৫৫-১৫৭)

আল্লাহ্‌র পথে প্রাণ উৎসর্গকারী সম্পর্কে আল্লাহ তা'লার অমোঘ ঘোষণা হলো, তারা মৃত নয় বরং জীবিত। আহমদীয়া জামা'তে বিগত শতাধিক বছর যাবৎ আল্লাহ্ তা'লার পথে প্রাণ বিসর্জন দেয়া হচ্ছে। তাদের কুরবানী কি বৃথা গিয়েছে? না, বরং যেখানে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এসব শহীদের মর্যাদাকে সমুন্নত করছেন সেখানে জামা'তকে পূর্বের চেয়ে অধিক উন্নতি দান করেছেন। এসব শহীদ যেখানে পরপারে সেই মর্যাদা লাভ করেছেন যা তাদের প্রাপ্য আর তাদের মর্যাদা সর্বদা বৃদ্ধি পেতে থাকবে, সেখানে এ পৃথিবীতেও চিরকালের জন্য তাদের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লার পথে তাদের প্রাণ উৎসর্গ করা কেবল নিজেদের জন্য নয়, বরং জামা'তের জীবন লাভেরও কারণ হচ্ছে। এটিই পরবর্তী প্রজন্মের জীবন এবং উন্নতির মাধ্যম হচ্ছে। তাহলে তারা কীভাবে মৃত হতে পারে? আহমদীয়া জামা'তে এই প্রাণের কুরবানী যা শহীদ হযরত সাহেবযাদা সৈয়্যদ আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.)'র কুরবানীর মাধ্যমে আরম্ভ হয়েছে তা সাধারণত আফগানিস্তান এবং উপমহাদেশীয় আহমদীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল। আফ্রিকায়ও ২০০৫ সনে কঙ্গোতে একজন নিষ্ঠাবান আহমদী কেবল জামা'তের জন্য প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন, কিন্তু অতিসম্প্রতি আফ্রিকা মহাদেশের দেশ বুরকিনা ফাসোতে ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা ও ঈমান এবং দৃঢ়বিশ্বাসে পরিপূর্ণ যে দৃষ্টান্ত জামা'তের সদস্যরা সম্মিলিতভাবে প্রদর্শন করেছেন তা বিস্ময়কর, যার কোনো জুড়ি নেই। যাদেরকে (একথা বলে) সুযোগ দেয়া হয়েছে যে, **"মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা অস্বীকার করো এবং এ বিষয়টি মেনে নাও যে, ঈসা (আ.) আকাশে জীবিত আছেন আর আকাশ থেকেই অবতরণ করবেন, তাহলে আমরা তোমাদের প্রাণ ভিক্ষা দেব।"** কিন্তু ঈমান ও বিশ্বাসে পরিপূর্ণ এসব লোক যাদের ঈমান পাহাড়ের চেয়েও অধিক দৃঢ় মনে হয় তারা জবাব দিয়েছেন, আজ নয় তো কাল– প্রাণ তো একদিন যাবেই। তাই এটি রক্ষার জন্য আমরা নিজেদের ঈমান বিকিয়ে দিতে পারি না। যে সত্যকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি তা আমরা পরিত্যাগ করতে পারি না। আর এভাবে তারা একজনের পর আরেকজন নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করতে থেকেছেন। তাদের নারী এবং শিশুরাও (লোমহর্ষক) এই দৃশ্য দেখছিল, অথচ কেউ কোনো আহাজারি পর্যন্ত করে নি।

অতএব এরাই সেসব মানুষ যারা আফ্রিকায় বরং আহমদীয়াতের ভুবনে নিজেদের কুরবানীর এক নতুন ইতিহাস রচনা করেছেন, অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেব (রা.)'র কুরবানীর পর। নিজেদের পার্থিব জীবন উৎসর্গ করে চিরস্থায়ী জীবনের অধিকারী হয়ে গেছেন। যারা তাদের প্রাণ, সম্পদ ও সময় কুরবানীর যে শর্তে বয়আত করেছেন তা

পূর্ণ করেছেন আর এমনভাবে পূর্ণ করেছেন যে, পরে এসেও পূর্ববর্তীদের চেয়ে এগিয়ে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রত্যেককে সেসব সুসংবাদের ভাগিদার করুন যেসব সুসংবাদ তিনি তাঁর পথে কুরবানীকারীদের জন্য দিয়েছেন।

এখন সংক্ষিপ্তভাবে এসব শহীদের জীবনী বর্ণনা করব যা থেকে তাদের ঈমানের দৃঢ়তা সম্পর্কে জানা যায়। প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী বুরকিনা ফাসোর ডোরি শহর যেখানে মেহদিয়াবাদ নামে নতুন একটি জনবসতি গড়ে উঠেছে সেখানকার জামা'তে **১১** জানুয়ারি এশার নামাযের সময় ৯জন আহমদী বুযূর্গকে মসজিদ প্রাঙ্গণে অন্য নামাযীদের সামনে ইসলাম আহমদীয়াত অস্বীকার না করার কারণে এক এক করে শহীদ করা হয়, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

প্রাপ্ত রিপোর্ট অনুযায়ী এশার সময় ৪টি মোটর সাইকেলে মোট ৮জন অস্ত্রধারী ব্যক্তি মসজিদে আসে। এই অস্ত্রধারীরা আহমদীয়া মসজিদে আসার পূর্বে নিকটবর্তী ওয়াহাবী মসজিদে অবস্থান করছিল আর সেখানে তারা মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত সময় অতিবাহিত করে, কিন্তু সেখানে তারা কারো কোনো ক্ষতি করে নি, কেননা তারা আহমদীদের উদ্দেশ্যেই এসেছিল। এই সন্ত্রাসীরা যখন আহমদীয়া মসজিদে আসে তখন মসজিদে এশার আযান হচ্ছিল। ততক্ষণে কিছু নামাযীও এসে গিয়েছিলেন এবং অন্যরাও আসছিলেন। আযান শেষ হওয়ার পর সন্ত্রাসীরা মুয়ায্যিনকে দিয়ে ঘোষণা করায় যে, বন্ধুরা দ্রুত মসজিদে চলে আসুন, কিছু লোক এসেছে তারা কথা বলবে। মানুষজন একত্রিত হওয়ার পর সন্ত্রাসীরা জিজ্ঞেস করে, এখানে মসজিদের ইমাম কে? **আলহাজ্ব ইব্রাহীম বিদিগা** সাহেব বলেন, তিনি হলেন মসজিদের ইমাম। এরপর তারা জিজ্ঞেস করে, নায়েব ইমাম কে? উত্তরে **আগ উমর আগ আব্দুর রহমান** সাহেব বলেন, তিনি নায়েব ইমাম। নামাযের সময় হয়ে গেলে ইমাম ইব্রাহীম সাহেব সন্ত্রাসীদের বলেন, আমাদেরকে নামায পড়ে নিতে দাও; কিন্তু তারা নামায পড়ার অনুমতি দেয় নি। অস্ত্রধারীরা ইমাম সাহেবের কাছে আহমদীয়া জামা'তের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বেশকিছু প্রশ্ন করে যার উত্তর ইমাম সাহেব অত্যন্ত ধীরেসুস্থে এবং সাহসিকতার সাথে প্রদান করেন। ইমাম সাহেব বলেন, আমরা মুসলমান আর আমরা মহানবী (সা.)-এর মান্যকারী। তারা জিজ্ঞেস করে, আপনারা কোন্ ফিরকার সাথে জড়িত? ইমাম সাহেব উত্তরে বলেন, আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য। অতঃপর ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তারা অর্থাৎ সন্ত্রাসীরা জিজ্ঞেস করে, আপনাদের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী হযরত ঈসা (আ.) জীবিত আছেন না কি মারা গেছেন? ইমাম সাহেব বলেন, হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন। যাহোক, একথা শুনে সন্ত্রাসীরা বলে, না, ঈসা (আ.) জীবিত আকাশে বিদ্যমান আর ফিরে এসে তিনি দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং মুসলমানদের সমস্যাদি নিরসন করবেন। এ আশাতেই তারা বুক বেঁধে বসে আছে। এরপর তারা জিজ্ঞেস করে, ইমাম মাহদী কে? ইমাম সাহেব বলেন, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মওউদ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। সব কথা শোনার পর অস্ত্রধারীরা বলে, আহমদীরা মুসলমান নয় বরং শক্ত কাফির। এরপর তারা ইমাম সাহেবকে মসজিদ সংলগ্ন আহমদীয়া সেলাই সেন্টারে নিয়ে যায়। সেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খলীফাদের ছবি টানানো ছিল। সেসব ছবি নিয়ে তারা পুনরায় ইমাম সাহেবকে নিয়ে মসজিদে ফিরে আসে। এরপর সেসব ছবি সম্পর্কে ইমাম ইব্রাহীম সাহেবকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। ইমাম সাহেব হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খলীফাদের নাম বলেন আর প্রতিটি ছবির পরিচয় তুলে ধরেন আর বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মওউদ হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। একথা শুনে তারা বলে, (নাউযুবিল্লাহ্) মির্যা গোলাম আহমদ-এর নবুয়্যতের দাবি মিথ্যা। এরপর সন্ত্রাসীরা মসজিদে উপস্থিত নামাযীদের মধ্য থেকে শিশু, যুবক এবং বৃদ্ধদের পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত করে। মসজিদে তখন আবালবৃদ্ধবনিতা মিলিয়ে ৬০ থেকে ৭০জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পর্দার আড়ালে **১০-১২**জন লাজনা নামাযের জন্য উপস্থিত ছিলেন। বয়সের দিক থেকে দল গঠনের পর সন্ত্রাসীরা বয়োজ্যেষ্ঠদের বলে, তারা যেন

মসজিদের আঙিনায় চলে আসে। তখন মোট ১০জন আনসার মসজিদে উপস্থিত ছিলেন যাদের মধ্যে একজন শারীরিকভাবে অক্ষমও ছিলেন। সেই অক্ষম ব্যক্তিও যখন অন্য আনসার ভাইদের সাথে বাহিরে যেতে উদ্যত হন তখন তাকে একথা বলে বসিয়ে দেয়া হয় যে, তুমি কোনো কাজের নও, বসে থাকো। অবশিষ্ট ৯জনকে সাথে নিয়ে তারা মসজিদের আঙিনায় চলে আসে। মসজিদের আঙিনায় দাঁড় করিয়ে তারা ইমাম ইব্রাহীম বিদিগা সাহেবকে বলে, তিনি যদি আহমদীয়াত পরিত্যাগ করেন তাহলে তাকে ছেড়ে দেয়া হবে। ইমাম সাহেব উত্তরে বলেন, চাইলে আমার শিরশ্ছেদ করো, কিন্তু আমি আহমদীয়াত পরিত্যাগ করতে পারবো না। যে সত্য আমি পেয়ে গেছি তা থেকে পিছপা হওয়া আমার জন্য সম্ভব নয়। ঈমানের বিপরীতে জীবনের কীই-বা মূল্য আছে? সন্ত্রাসীরা তার গলায় ছুরি ধরে এবং তাকে শুইয়ে জবাই করতে উদ্যত হয়। কিন্তু ইমাম সাহেব বাধা দিয়ে বলেন, আমি শুয়ে মরার চেয়ে দাঁড়িয়ে প্রাণ বিসর্জন দেয়া পছন্দ করব। ফলে ইমাম সাহেবকে তারা গুলি করে শহীদ করে। **সর্বপ্রথম শহীদ হন ইমাম আলহাজ্ব ইব্রাহীম বিদিগা সাহেব**। ইমাম সাহেবকে নৃশংসভাবে শহীদ করার পর সন্ত্রাসীরা মনে করে, বাকিরা হয়তো ভয় পেয়ে ঈমান থেকে পিছপা হবে। তাই তারা পরবর্তী আহমদী বুযূর্গকে বলে, তুমি আহমদীয়াত ছাড়বে, নাকি তোমারও একই অবস্থা করব যা তোমাদের ইমামের করেছি? উত্তরে সেই বুযূর্গ অত্যন্ত সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে বলেন, আহমদীয়াত ছাড়া সম্ভব নয়। যে পথে চলে আমাদের ইমাম প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন আমরাও সেই পথেই চলব। তারপর তাকেও মাথায় গুলি করে শহীদ করা হয়। পরে যারা ছিলেন তাদেরকেও এক এক করে একই কথা বলা হয় যে, ইমাম মাহদীকে অস্বীকার করো এবং আহমদীয়াত পরিত্যাগ করো তাহলে তোমাদেরকে কিছুই বলা হবে না, জীবিত ছেড়ে দেয়া হবে। তখন উপস্থিত সকল আহমদী বুযূর্গ পর্বতসম অবিচলতা প্রদর্শন করেন এবং বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে শাহাদতকে আলিঙ্গন করেন। কোনো একজনও সামান্যতম দুর্বলতা প্রদর্শন করেন নি আর আহমদীয়াতও পরিত্যাগ করেন নি। একের পর এক শহীদ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন, কিন্তু কারো ঈমান দোদুল্যমান হয় নি। সবাই একে অপরের চেয়ে অধিক দৃঢ় ঈমান ও সাহসিকতা প্রদর্শন করেন এবং ঈমানের পতাকা উড্ডীন রেখে আল্লাহ্ তা'লার সমীপে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেন। প্রত্যেক শহীদকে কমবেশি তিনটি করে গুলি করা হয়েছে। এই ৯জন শহীদের মাঝে দু'জন যমজ ভাইও ছিলেন। ৮জনকে শহীদ করা পর শেষে গিয়ে আগ উমর আগ আব্দুর রহমান সাহেব, যার বয়স ছিল ৪৪ বছর, তিনি বাকি ছিলেন। সকল শহীদের মধ্যে তিনি বয়সে সবার ছোট ছিলেন। সন্ত্রাসীরা তাকে বলে, তুমি এখনো যুবক, আহমদীয়াত পরিত্যাগ করে নিজের জীবন বাঁচাতে পারো। তখন তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সাথে উত্তর দেন, যে পথ অবলম্বন করে আমার জ্যেষ্ঠরা কুরবানী দিয়েছেন, যা সত্যের পথ– আমিও আমার ইমাম এবং বুযূর্গদের পদাঙ্ক অনুসরণে ঈমানের খাতিরে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছি। ফলে তাকেও অত্যন্ত নির্মমভাবে শহীদ করা হয়।

হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ শহীদ সাহেবের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তায্কেরাতুশ্ শাহাদাতাইন পুস্তকের শেষের দিকে একটি স্বপ্নের উল্লেখ করেছেন। এরপর তিনি (আ.) স্বপ্নের উল্লেখ করে লিখেন, **'খোদা তা'লা তার স্থলাভিষিক্ত অনেক লোককে সৃষ্টি করবেন।'** তিনি তাঁর স্বপ্নের এ ব্যাখ্যা করেছেন যে, আমি আশা করি, সাহেবযাদা সাহেবের শাহাদতের পর আল্লাহ্ তা'লা তার স্থলাভিষিক্ত অনেক লোককে সৃষ্টি করবেন। আমরা সাক্ষী, আজ আফ্রিকার অধিবাসীরা সম্মিলিতভাবে এর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন আর 'স্থলাভিষিক্ত' হওয়ার দাবি পূরণ করেছেন!

জঙ্গীদের মসজিদে আসা থেকে আরম্ভ করে প্রশ্নোত্তর করা, ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা এবং পুরো কার্য সমাধা করে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত সময়ের হিসাব করলে প্রায় দেড় ঘন্টা হয়। এই সময়ে শিশুকিশোর এবং অন্য সদস্যরা যে যন্ত্রণা ও কষ্টে পার করেছে তা সহজেই অনুমেয়। (কেননা) তাদের (চোখের) সামনে তাদের জ্যেষ্ঠদের শহীদ করা হচ্ছিল।

মসজিদ থেকে বেরিয়ে জঙ্গীরা তৎক্ষণাৎ পালিয়ে যায় নি বরং দীর্ঘক্ষণ মেহদিয়াবাদেই অবস্থান করে। সশস্ত্র জঙ্গীরা মসজিদে উপস্থিত লোকদের এই হুমকিও দেয় যে, তোমরা আহমদীয়াত পরিত্যাগ করো– এতেই তোমাদের মঙ্গল নিহিত। আমরা আবারো আসবো। তোমরা যদি আহমদীয়াত পরিত্যাগ না করো অথবা কেউ যদি পুনরায় মসজিদ খোলার চেষ্টা করে তাহলে তোমাদের সবাইকে হত্যা করা হবে।

এই মেহদিয়াবাদ জামা'তের গোড়াপত্তন কবে হয়েছিল এবং এর পরিচিতি কী– এ সম্পর্কে তারা লিখেছে, ১৯৯৮ সালের শেষদিকে এখানে যথারীতি মিশন আরম্ভ করা হয়েছিল। জামা'ত দ্রুত উন্নতি করে। ১৯৯৯ সালে একটি গ্রাম **তিকনেওয়েলের** সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আহমদী হয়ে যায় এবং একটি নিষ্ঠাবান জামা'ত এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই গ্রামের ইমাম আলহাজ্ব ইব্রাহীম বিদিগা সাহেব আহমদীয়াত গ্রহণ করার পূর্বে অত্রাঞ্চলের সবচেয়ে বড় ওয়াহাবী ইমাম ছিলেন। তিনি অনেক গবেষণা করার পর বয়আত করেছিলেন। বয়আত করার পর তিনি একজন উদ্যমী দাঈ বা প্রচারক, একজন নির্ভীক মুবাল্লিগ এবং বীর সৈনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। আমি পূর্বে উল্লেখ করি নি, তিনি আরো বলেছেন, তিনি যখন বয়আত করেন তখন তার সঙ্গী কয়েকজন আলেম তাকে বলেন, তুমি কেন (আহমদীয়াত) গ্রহণ করছ? তিনি উত্তরে বলেন, আমি যখন স্বর্ণ দেখেছি এবং আল্লাহ্ তা'লা একে (গ্রহণ করার) নির্দেশও দিয়ে রেখেছেন, মহানবী (সা.)-এর হাদীস পূর্ণ হচ্ছে, কথাও পূর্ণ হচ্ছে, পবিত্র কুরআন এর সাক্ষ্য দিচ্ছে, তাই এখন আমি এটি অস্বীকার করবো আর (এ থেকে) বঞ্চিত থাকব– তা কীভাবে সম্ভব! যাহোক, ইমাম সাহেব অনেক জ্ঞানী একজন মানুষ ছিলেন। এই গ্রামের সব মানুষ **তামাশিক গোত্রের** সদস্য এবং তামাশিক ভাষায় কথা বলে। তামাশিক লোকদের সংখ্যা দুই লক্ষের কাছাকাছি বলা হয়ে থাকে। এরা বুরকিনা ফাসো, নাইজার, মালি এবং আলজেরিয়াতে বসবাস করে। (এদের) ৯৯.৯% মুসলমান। এদের অধিকাংশই কট্টর ওয়াহাবী বিশ্বাস পোষণ করে। তামাশিক লোকদের মাঝে আহমদীদের সংখ্যা খুব বেশি একটা নেই, তবে বুরকিনা ফাসোতে মেহদিয়াবাদের তামাশিক বাসিন্দারা হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আত করার ক্ষেত্রে এগিয়ে যায়। আর এখন এত বড় কুরবানী দিয়ে নিজেরা একটি বিশেষ মর্যাদাও অর্জন করে নিয়েছে। ২০০৪ সালে অত্রাঞ্চলে স্বর্ণের অনেক বড় বড় খনি আবিষ্কৃত হলে মাইনিং কোম্পানী এই গ্রামের বাসিন্দাদের নিকটস্থ একটি নতুন স্থানে ঘরবাড়ি বানিয়ে দিয়ে বলে, সেখানে স্থানান্তরিত হয়ে যাও। এসব স্থানান্তরিত লোকের একটি বড় অংশ ছিল আহমদী। অল্প কয়েকটি পরিবার ছিল অন্যদের। নতুন গ্রাম বানানো হয়েছিল যা (বলতে গেলে) প্রায় আহমদীদেরই গ্রাম ছিল। ইব্রাহীম সাহেব প্রস্তাব দেন, এই গ্রামের পুরোনো নাম আর রাখব না। তিনি আমাকে লিখেন, আপনি (আমাদের) এই গ্রামের একটি নাম রেখে দিন। এরপর এর নাম মেহদিয়াবাদ রাখা হয়। ২০০৮ সালে এখানে IAAAE (International Association of Ahmadi Architects & Engineers)-এর অধীনে মডেল ভিলেজ বা আদর্শ গ্রাম নির্মাণ করা হয়। পানি, বিদ্যুতের সুবিধা প্রদান করা হয়। এটি বুরকিনা ফাসো বরং সমগ্র বিশ্বের প্রথম মডেল ভিলেজ প্রজেক্ট ছিল। এর অধীনে গ্রামে বিদ্যুৎ, পানি, সেলাই স্কুল ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

শহীদদের দাফনের ব্যাপারে তারা তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে, জঙ্গীরা মসজিদে দেড় ঘন্টা অতিবাহিত করে এমন ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল যে, যে স্থানে শাহাদাত হয়েছিল সেখানেই শহীদদের লাশগুলো সারারাত পড়ে ছিল। কেননা আশঙ্কা ছিল জঙ্গীরা (এখনো) গ্রামের বাইরে যায় নি আর যদি কেউ লাশ উঠানোর চেষ্টা করে তাহলে তাকেও মেরে ফেলা হবে। নিকটেই সেনা ক্যাম্প ছিল। এই ঘটনার সংবাদ তাদেরকে দেয়া হয়, কিন্তু সেখান থেকেও কেউ আসে নি আর সকাল পর্যন্ত নিরাপত্তা বিভাগের কোনো সদস্যও পৌঁছে নি। এরপর ১২ জানুয়ারি সকাল ১০টায় মেহদিয়াবাদে শহীদদের সমাহিত করা হয়।

এখন আমি তাদের প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি বর্ণনা করছি। **আলহাজ্ব ইব্রাহীম বিদিগা সাহেব**, যিনি ইমাম ছিলেন, যার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে; শাহাদত বরণের সময় তার বয়স ছিল ৬৮ বছর। শিক্ষার্জনের উদ্দেশ্যে তিনি সৌদি আরবেও অবস্থান করেছেন। **তামাশিক ভাষার বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন এবং এই ভাষায় পবিত্র কুরআনের তফসীরকারকও ছিলেন।** তিনি ১৯৯৯ সালে বয়আত করেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে ইমাম ইব্রাহীম বিদিগা সাহেব অনেকগুলো গ্রামের প্রধান ইমাম ছিলেন। এই অঞ্চলের বিভিন্ন আলেম তার পাশে এসে বসা এবং জ্ঞানার্জন করাকে নিজেদের জন্য সম্মানের কারণ মনে করতো। অতএব প্রত্যেক বছর কমপক্ষে একবার অত্রাঞ্চলের আলেম-ওলামা, মুয়াল্লিমীন এবং ইমামরা তার নিকট এসে অবস্থান করে কল্যাণমণ্ডিত হতেন। এদের সংখ্যা ৫০০ পর্যন্ত পৌঁছে যেতো এবং এক সপ্তাহ পর্যন্ত তারা অবস্থান করতেন। বলা যায়, অত্রাঞ্চলের আলেম-ওলামা ও ইমামদের বার্ষিক সভা তার বাড়িতেই হতো। তার একজন শিষ্য বর্ণনা করেন, সেই দিনগুলোতেও ইমাম সাহেব প্রায়শই একথা বলতেন যে, এখনো সত্য প্রকাশিত হয় নি; কেননা সত্যের মান্যকারীরা স্বল্প হয়ে থাকে। যেভাবে শত শত সংখ্যায় এই ইমামরা আমার নিকট এসে বসে এবং বাহ্যত একে অপরকে মুসলমান জ্ঞান করে, কিন্তু যখন সত্য প্রকাশিত হবে তখন মান্যকারীর সংখ্যা স্বল্প হবে, (তখন) এরাও আমার কাছ থেকে উঠে চলে যাবে। পুণ্য ছিল, তাকওয়া ছিল, জ্ঞান ছিল, তাই যুগের অবস্থার নিরিখে ধারণা করে নিয়েছিলেন যে, সত্য প্রকাশিত হবে এবং এরপর যেভাবে সর্বদা নবীদের বিরোধীদের রীতি রয়েছে (সে অনুসারে) এরাও বিরোধিতা করবে। যাহোক, তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিলেন, সত্য এলেই আমি মেনে নেবো। ১৯৯৮ সালে ডোরিতে রীতিমত আহমদীয়া মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ইমাম ইব্রাহীম সাহেবের নিকটও এর সংবাদ, অর্থাৎ আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছে। তবলীগি কার্যক্রমের সময় একটি বাজারে আলহাজ্ব বিদিগা সাহেব প্রথম আহমদীয়াতের নাম শুনেছিলেন। তিনি জানতে পারেন, আহমদীরা ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুতে বিশ্বাসী এবং মসীহ্ ও মাহদীর আগমনের সংবাদ প্রদান করে থাকে। তখন ইব্রাহীম বিদিগা সাহেব সাত সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে সত্যের সন্ধানে ডোরি মিশন হাউজে আসেন। অনেক গবেষণার পর তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। নিজ অঞ্চলে তিনি প্রথম আহমদী হবার সৌভাগ্য লাভ করেন। এই যে বিরুদ্ধবাদীরা বলে থাকে, এরা দরিদ্র মানুষ, (অর্থের) প্রলোভন দেখিয়ে তাদের বয়আত করায়, তারা ধর্ম সম্পর্কে কিছুই জানে না– এই শহীদরা তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন। ভালোভাবে বুঝে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তীতে কুরবানীরও উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

যাহোক, ইব্রাহীম সাহেব সম্পর্কে আরো লিখেছেন, পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, জামা'তের একজন নির্ভীক সৈনিক ছিলেন। সাহসী দাঈ ইলাল্লাহ্ ছিলেন আর সত্যিকার অর্থেই একজন নিবেদিতপ্রাণ আহমদী ছিলেন। তার তবলীগি চেষ্টা-প্রচেষ্টায় গোটা অঞ্চলে আহমদীয়াতের বাণী ছড়িয়ে পড়ে। অনেকগুলো জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি সর্বাগ্রে বিভিন্ন জামা'তী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে তার বিশ্বাস অনুযায়ী ওয়াহাবী ছাড়া অন্য সকল ফির্কাই কাফির ছিল। টিভি দেখা, ফুটবল খেলা বা দেখা, স্কুলে যাওয়া, চিত্রাঙ্কন করা– এসব কাজই তার মতে হারাম ছিল, যেমনটি ওয়াহাবীদের ধর্মবিশ্বাস। কিন্তু এরপর তিনি যখন আহমদীয়াত গ্রহণ করেন তখন এসব অহেতুক ধ্যানধারণা হতে নিজেকে মুক্ত করেন এবং লোকদেরও বুঝান যে, প্রকৃত সত্য কী। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র যুগে ২০০০ সালে এখানে যুক্তরাজ্যের জলসায় অংশগ্রহণেরও তিনি সৌভাগ্য লাভ করেন। তবলীগ করার ক্ষেত্রে তার উন্মাদনা ছিল। আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বেও (একজন) প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং অনেকগুলো গ্রামের প্রধান ইমাম ছিলেন, যেমনটি আগেই বলা হয়েছে। (আর) আহমদীয়াত গ্রহণের পর নিজেকে তিনি তবলীগের জন্য উৎসর্গ করে দেন। এমন মনে হতো যেন তার অন্য কোনো কিছুর পরওয়াই নেই। তিনি তবলীগের হোয়াটসএ্যাপ গ্রুপ বানিয়ে রেখেছিলেন যাতে বিশেষত তামাশিক লোকদের জন্য একটি গ্রুপ ছিল।

এই গ্রুপে মালি, নাইজার, ঘানা, সৌদি আরব, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, আইভরি কোস্ট ইত্যাদি দেশ থেকে মানুষ যোগ দিতো। অনবরত তাদেরকে তবলীগ করতেন। দিনরাত অডিও বার্তা রেকর্ড করে প্রেরণ করতে থাকতেন। দিন হোক বা রাত, এই কাজেই মগ্ন থাকতেন। উত্তরে বিরোধীরা তাকে গালিগালাজের বার্তাও পাঠাতো। সেখানেও বিরোধিতা হতো, তাকে হত্যার হুমকিও দেয়া হতো। কিন্তু তিনি কখনো কারো সাথে রেগে কথা বলতেন না। বরং যারা হত্যার হুমকি দিতো তাদেরকে তিনি বলতেন, আমি তোমাকে (যাতায়াতের) ভাড়া পাঠাচ্ছি, এসে আমাকে হত্যা করে যাও। মুবাল্লিগ এবং মুয়াল্লিমদেরও তিনি বলতেন, তবলীগ করা উচিত। পরিস্থিতি ভালো নয়, তাই আমরা তবলীগি সফরে যেতে পারব না– এটি একটি অজুহাত মাত্র। অর্থাৎ যখন পরিস্থিতি খারাপ হয়েছে (তখন)। তিনি বলেন, মিডিয়ার মাধ্যমে তবলীগ করুন। আর যদি কারো কাছে ফোনে ইন্টারনেট প্যাকেজ নেয়ার মতো অর্থ না থাকে তাহলে আমার কাছ থেকে নিয়ে নিন আর সোশ্যাল মিডিয়া গ্রুপ বানিয়ে ঘরে বসে তবলীগের জিহাদে অংশগ্রহণ করুন। এক প্রকার উন্মাদনা এবং এক বিশেষ আগ্রহ ছিল তার।

নাসের সিদ্ধু সাহেব এখানে মুরব্বী ছিলেন। তিনি বলেন, ১৯৯৭ সনে বুরকিনা ফাসো এসেছি। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) দাওয়াত ইলাল্লাহ্‌র কাজের দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি বলেন, আমি ভাষা জানতাম না, তাই পরিকল্পনা প্রণয়নে তিন মাস সময় লেগে যায়। এরপর বিভিন্ন গ্রামে সফর করি। এখানে এই গ্রামের ইমামের কাছেও যাই। তিনি যখন ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু এবং মসীহ্ ও মাহদীর আগমনের সংবাদ পান, তখন ইব্রাহীম বিদিগা সাহেব ৭জন লোক সাথে নিয়ে ডোরিতে আমাদের মিশন হাউজে আসেন। সেখানে প্রশ্নোত্তর হয়। তিনি বলেন, তিন দিন তিনি আমার কাছে অবস্থান করেন। এই তিন দিন তিনি নিজেও ঘুমান নি আর আমাকেও ঘুমাতে দেন নি। এরপর তারা চলে যান। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আলোচনা হতো। পরের সপ্তাহে তিনি পুনরায় আসেন এবং তাদের নতুন ইমামকে নিয়ে আসেন আর অনুসন্ধানের এই ধারা তিন মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। তিনি অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু আহমদীয়াত গ্রহণের কথা তিনি কখনো বলেন নি। তিনি বলেন, যাহোক আমি খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-কে দোয়ার জন্য (পত্র) লিখতে থাকি। **একদিন ইমাম সাহেব আসেন আর বয়আতের ফরম পূরণ করে দেন। তিনি বলেন, আমি তাকে বলি, বাকি যারা (এতদিন) নিয়মিত এসেছেন তারা কোথায়? তারা কখন (আহমদীয়াত) গ্রহণ করবে? তখন তিনি বলেন, তারা সবাই গ্রহণ করবে, কিন্তু সর্বপ্রথম আমি আহমদীয়াত গ্রহণ করতে চাচ্ছিলাম, তাই আমি চলে এসেছি। খিলাফতের সাথেও তিনি গভীর নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন।**

বুরকিনা ফাসো জামা'তের আমীর সাহেব লিখেন, ৪৫টির মতো গ্রাম তার প্রভাবাধীন ছিল। তিনি হজ্জ করেছেন। সেখানে থেকে শিক্ষা অর্জন করেছেন। খুব ভালো আরবী জানতেন এবং বলতে পারতেন আর এই পুরো অঞ্চলে অনেক তবলীগ করেছেন। সাইকেলে করে গ্রামে গ্রামে যেতেন আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অত্র অঞ্চলে বহু মানুষকে আহমদীয়াতের আলোয় আলোকিত করেছেন। তার মাধ্যমে এই এলাকার বড় বড় আলেম আহমদীয়াত গ্রহণ করেছে আর (এই) এলাকার অধিকাংশ জামা'ত তার তবলীগের ফলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যখনই লন্ডন আসা হতো তখন সর্বদা জিজ্ঞেস করতেন, যুগ খলীফা কেমন আছেন? ঐকান্তিক ভালোবাসা প্রকাশ করতেন। তিনি বলেন, এই ভালোবাসার একটি উদাহরণ হলো, এমটিএ-তে শিশুদের সাথে আমার যে ক্লাস হতো, উর্দূ ভাষার কিছুই না জানা সত্ত্বেও অত্যন্ত নিমগ্নচিত্তে তা দেখতে থাকতেন যেন বুঝতে পারছেন। এছাড়া কেবল একথাই বলতেন যে, আমার জন্য এখানে এই সভায় বসে এ অনুষ্ঠান দেখাই আমার ঈমানে অনেক উন্নতির কারণ হয়। অতিথিপরায়ণ ও নীরব প্রকৃতির (মানুষ) ছিলেন, কিন্তু জামা'তের প্রয়োজনে কিছু বলার প্রয়োজন হলে খুবই আবেগের সাথে কথা বলতেন। একজন পুরোদস্তুর মুবাল্লিগ ছিলেন। অ-আহমদীদের সাথে ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে তিনি অনেক ধর্মীয় বিতর্ক এবং প্রশ্নোত্তর করেছেন।

অতঃপর সেখানকার আরেকজন মুরব্বী মুহিবুল্লাহ্ সাহেব বলেন, এসব বুযূর্গকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম, কেননা সেখানে আমি প্রায়শ যাতায়াত করতাম। তারা খিলাফতের প্রতি অপরিসীম ভালোবাসা পোষণকারী, অতিথিপরায়ণ ও বিশ্বস্ত লোক ছিলেন। তিনি বলেন, সব যুবকেরা যখন সারা দিন কাজে ব্যস্ত থাকতো তখন এই বুযূর্গেরা মসজিদের সামনে ছাউনি দেওয়া জায়গায় বসে এমটিএ দেখতেন। তিনি বলেন, তারা শহীদ হওয়ার অব্যবহিত পর আমার নিকট এক যুবকের ফোন আসে যে, এভাবে আমাদের বুযূর্গদের শহীদ করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছিল, যদি আপনারা আহমদীয়াত পরিত্যাগ করেন তাহলে আমরা আপনাদের ছেড়ে দেব, কিন্তু তারা শাহাদাত বরণকেই প্রাধান্য দেন; এই যুবক একথাই বলেছে। **এই যুবকের ভাষ্য ছিল, এরা যদি আমাদের সবাইকে শহীদ করে তবুও আমরা আহমদীয়াত পরিত্যাগ করবো না। এই যুবক ছেলেটি বলে, এখানে তো কেবল ৯জন আনসার ছিলেন, যদি আমাদের সব খোদ্দাম এবং লাজনাদেরকেও শহীদ করে তবুও আমরা আহমদীয়াত ছাড়বো না, ইনশাআল্লাহ্।** এটি হলো এই জামা'তের উক্ত নিষ্ঠাবান সদস্যদের প্রেরণা যা তারা (নিজেদের মাঝে) সৃষ্টি করেছেন। যখন বড়দের তরবীয়ত থাকে, তাদের দৃষ্টান্ত থাকে, তখনই যুবক ও নারীদের মাঝে এরূপ প্রেরণা ও ঈমান সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় মুবাল্লিগ মায়েগা তেজান সাহেব বলেন, ইমাম ইব্রাহীম সাহেবকে হত্যার হুমকি দেয়া হচ্ছিলো। শাহাদতের কিছুদিন পূর্বে তিনি আমাকে বলেন, আমাকে হত্যার হুমকি দেয়া হচ্ছে, এরা আমাকে মেরে ফেলবে। তার উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে তিনি বলেন, নিজ পরিবার এবং আত্মীয়স্বজনের সাথে খুবই উত্তম আচরণ করতেন। সবার সাথে সহানুভূতি প্রদর্শন করা তার অভ্যাস ছিল। অন্যের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা এবং ত্যাগের স্পৃহা দেখানো তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। নিজ এলাকার অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মানুষ তাকে খুবই শ্রদ্ধা করতো। ইব্রাহীম সাহেব কোনো সিদ্ধান্ত দিলে অথবা কোনো কথা বললে মানুষ সেটির সম্মান করতো এবং তা মেনে নিতো। তার শিষ্যের সংখ্যা অনেক। তাদের মধ্য থেকে কতক অন্যান্য প্রতিবেশী দেশে ইমাম ও মুয়াল্লিম হিসেবে কাজ করছে। বুরকিনা ফাসোতেও অনেকেই মুয়াল্লিম এবং স্থানীয় মিশনারী হিসেবে কাজ করছে। তিনি আরো বলেন, পুণ্য, তাকওয়া এবং সৎকর্মে অগ্রগামী থাকার ক্ষেত্রে অন্যদের জন্য তিনি আদর্শ ছিলেন। যখনই জামা'তের সদস্যদের জন্য কোনো তাহরীক করতেন তখন সর্বপ্রথম নিজে তাতে অংশগ্রহণ করতেন। আর্থিক কুরবানীর কোনো তাহরীক হলে সবার আগে নিজে (তাতে) অংশ নিতেন। জামা'তের বিভিন্ন কাজ, জলসা, ইজতেমা এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে (অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে) কখনো পিছিয়ে থাকেন নি। পাঁচবেলার নামাযই তিনি মসজিদে এসে পড়তেন। তাহাজ্জুদ নামাযে অভ্যস্ত ছিলেন। কখনো কোনো জামা'তী অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকলে এর অর্থ হচ্ছে হয় তিনি অসুস্থ নতুবা সফরে আছেন। জামা'তী কাজে অংশগ্রহণের জন্য কখনোই তিনি খরচের পরওয়া করতেন না। তিনি দু'টি বিয়ে করেছিলেন, যাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা তাকে ১১জন সন্তান দান করেছেন।

মুরব্বী খালেদ মাহমুদ সাহেব লিখেন, তারা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ ছিলেন। খিলাফতের প্রেমিক এবং নিবেদিতপ্রাণ আহমদী ছিলেন। তিনি বলেন, ২০০৮ সনে যখন আমার সফর হয়েছিল, খিলাফত শতবার্ষিকীর বছর ছিল, আমি ঘানায় সফরে গিয়েছিলাম এবং জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। তখন বুরকিনা ফাসো, মালি প্রভৃতি দেশ থেকেও হাজার হাজার আহমদী আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। এই উপলক্ষ্যে ঘানা জামা'ত আতিথেয়তা ও আবাসনের ভালো ব্যবস্থাই করেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও ডোরি থেকে আগমনকারী কিছু লোক যাদের মাঝে এরাও (অর্থাৎ শাহাদাত বরণকারীরাও) অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাদের খাবার পেতে বিলম্ব হয় অথবা তারা খাবার পান নি। এরপর রাতে অনেক দেরিতে বাজার থেকে (খাবার) এনে তাদের দেয়া হয়। এতে আমি সেই মুরব্বী সাহেবকে যার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল বলেছিলাম, তাদের কাছে আমার পক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন এবং তাদের মনস্তুষ্টি করবেন। তিনি বলেন, তৎক্ষণাৎ আমি তাদের কাছে গিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করি। অথবা আপনার বার্তা যখন তাদের কাছে পৌঁছে দিই তখন জামা'তের প্রেসিডেন্ট

ছিলেন আলহাজ্ব ইব্রাহীম সাহেব। তিনি বাকি লোকদের সাথে একবাক্যে বলেন, আমরা এখানে এসেছিলাম যুগ খলীফাকে দেখতে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে। তাই তাঁকে দেখে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের পরই আমাদের ক্লান্তি ও ক্ষুধা দূর হয়ে গেছে, আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। বরং আমরা তো একত্রে বসে এই সাক্ষাৎ নিয়েই কথা বলছি এবং এর স্বাদ উপভোগ করছি। যাহোক, তখন আমারও চিন্তা ছিল যে, এত দীর্ঘ সফর করে এসেছেন, অনেকে তখন সাইকেলে করেও এসেছিলেন আর তাদের ব্যবস্থা হয় নি। তাই দ্রুত ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু অপরদিকে তাদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা এরূপ ছিল যে, আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তখনো আমি তাদের এ সংবাদই পেয়েছিলাম আর **তখনো আমি বিস্মিত ছিলাম যে, এরা কেমন দৃঢ় ঈমানের মানুষ!**

মুয়াল্লিম আলহাজ্ব মাহমুদ ডিকো সাহেব বলেন, শরীফ ওদেহ্ সাহেব বেনিন সফরে আসেন। তখন ইমাম সাহেব বুরকিনা ফাসো থেকে বাসে করে রাতের বেলা এক হাজার কিলোমিটার সফর করে ভোর ৩টায় সেখানে পৌঁছেন। ৩০ ঘন্টার ক্লান্তিকর সফর ছিল, সেখানকার রাস্তাও ভালো না, তথাপি তিনি বেশ উৎফুল্ল ছিলেন। পরে আরো দীর্ঘ সফর করার ছিল, সেটিও তিনি তাদের সাথে করেছেন এবং সব প্রোগ্রামেও অংশগ্রহণ করেছেন। **তার মাঝে জামা'তের সেবা করার এক উদ্দীপনা ছিল।** বেনিনে বিভিন্ন মসজিদ দেখে খুব খুশি হতেন এবং বলতেন, দেখো! এটিও তো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার একটি প্রমাণ। অনুরূপভাবে অ-আহমদীদের সাথে যে বিতর্ক হতো সেখানে তিনি আরবীতে খুবই জ্ঞানগর্ভ ও প্রাঞ্জল বক্তৃতা করতেন। শরীফ ওদেহ্ সাহেবের সাথেও মৌলবীদের বিতর্ক হচ্ছিল। তখন তারা কোনো বাজে কথা বলে বসলে তিনি রাগ করে উত্তর দিতে উদ্যত হন, কিন্তু তাকে চুপ করতে বললে সাথে সাথেই তিনি বসে পড়েন। এরপর অ-আহমদীরা বলে, তোমরা যদি আমাদেরকে মুসলমানই মনে করো তবে আমাদের পেছনে নামায পড়ো। তখন তিনি দাঁড়িয়ে বলেন, যারা আমাদেরকে কাফির বলে এবং যুগ-ইমামকে গ্রহণ করে না– এটি কীভাবে সম্ভব যে, আমরা তাদের পিছনে নামায পড়ব? এটি মেনে নাও যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যুগ-ইমাম, তবে আমরা নামায পড়ব।

বেনিনের একজন অবসরপ্রাপ্ত স্থানীয় মুয়াল্লিম বলেন, তিনি যুগ-খলীফার প্রতি ভালোবাসার এক বাস্তব চিত্র ছিলেন। তিনি বলতেন, আমি যখন পাকিস্তানি মুবাল্লিগের কাছ থেকে আহমদীয়াতের সংবাদ পেয়েছিলাম সেদিন থেকেই আহমদী হয়ে গিয়েছি। **আমি এটি শিখেছি যে, জগদ্বাসীর কল্যাণ শুধুমাত্র খিলাফত ব্যবস্থার সাথেই সম্পৃক্ত এবং এটিই প্রকৃত পথ আর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকব।** মুয়াল্লিম সাহেব বলেন, তিনি যা বলেছিলেন তা সত্যিকার অর্থেই করে দেখিয়েছেন।

এরপর বেনিনের স্থানীয় মুয়াল্লিম ঈসা সাহেব বলেন, তাঁর সাথে আমার দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক ছিল। তিনি এমন একজন আহমদী ছিলেন যার সাথে কারোই কোনো বিরোধ ছিল না। তিনি সত্যিকার আহমদী ছিলেন, এরূপ আহমদী যিনি সকল পুণ্যকর্মে অগ্রগামী ছিলেন। তবলীগ করা, চাঁদা দেয়া সর্বক্ষেত্রে প্রথম (সারিতে) ছিলেন। তাঁর কারণেই বাকি ৮জন আনসারও তাঁর পেছনে 'লাব্বাইক' বলে খোদার সমীপে নিজেদের প্রাণ উৎসর্গকারী হয়ে গিয়েছেন।

বুরকিনা ফাসোর জামেয়ার প্রিন্সিপাল সাহেব লিখেন, জনৈক ব্যক্তি একটি স্বপ্ন দেখে। এতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) জামা'তের আমীর সাহেবকে একথা লিখে পাঠান যে, **"এটি একটি শুভ স্বপ্ন আর এর অর্থ হলো, দেশের মাটি সত্য গ্রহণের জন্য উর্বর আর আমার সফরের পর ইনশাআল্লাহ্ সত্য গ্রহণ করে (মানুষ) ঐশী আলোয় আলোকিত হয়ে উঠবে। আল্লাহ্ করুন, এমনই যেন হয়।"** (মোকররম এডিশনাল উকিলুত্ তবশীর সাহেবের পত্র। লন্ডন **T.3360**, ১৯ জুন, ১৯৯০)

আমার জানা মতে, (পরে) সেখানে আর খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র সফর হয় নি। যাহোক, আমি সেখানে ২০০৪ সালে সফরে গিয়েছিলাম। তিনি বলেন, এরপর আপনিও লিখেছিলেন যে, আমার পূর্ণ বিশ্বাস বুরকিনা ফাসোর মাটিতে আহমদীয়াতের যে বীজ বপন করা হয়েছে তা অতি

দ্রুত স্থায়ী ফল দেবে। বুরকিনা ফাসোর মানুষ আসলেই অনেক বড় মাপের মানুষ আর আমি আনন্দিত এই কারণে যে, খোদা তা'লা তাদেরকে আহমদীয়াতের আলোয় আলোকিত করেছেন। আমি বুরকিনা ফাসো জামা'তের সদস্যদের মাঝে যে জাগরণ দেখেছি তা ছিল অবাক করার মতো। আমি আশা রাখি, আগামী দুই-তিন বছরে এই সফরের সুমহান ফল প্রকাশ পাবে আর জামা'ত দ্রুত উন্নতি করবে, ইনশাআল্লাহ্। **(পত্রের সূত্রঃ T.9653, ১ মে, ২০০৪)**

আমি আমার সফরের পর তাদেরকে এটি লিখেছিলাম। আফ্রিকার জামা'তগুলোর মধ্যে বুরকিনা ফাসোর আহমদীদের মাঝে আমি এক বিশেষ গুণ লক্ষ্য করেছি আর তা হলো, সাক্ষাতের সময় সবাই আমার সাথে কোলাকুলি করার চেষ্টা করতো। এছাড়া তাদের ভালোবাসার যে বহিঃপ্রকাশ তা-ও দেখার মতো ছিল। প্রিন্সিপাল সাহেব লিখেন, আজ মেহদিয়াবাদের নিষ্ঠাবান আহমদীরা তাদের অসাধারণ কুরবানী প্রদানের মাধ্যমে আপনার লেখা **"সত্যিই অনেক বড় মাপের মানুষ"** এই বাক্যের ওপর সত্যায়নকারী মোহর লাগিয়ে দিয়েছে।

দ্বিতীয়জন হলেন, **আল হাসান আগ মালিয়েল সাহেব**। শাহাদতের সময় তাঁর বয়স ছিল ৭১ বছর। পেশার দিক থেকে তিনি কৃষক ছিলেন। ১৯৯৯ সালে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। গ্রামের প্রারম্ভিক আহমদীদের একজন ছিলেন। ইব্রাহীম সাহেবের সাথে ডোরি মিশনে যাওয়া অনুসন্ধিৎসু দলে তিনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বয়আত করার পর থেকেই নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততায় উন্নতি করতে থেকেছেন। খিলাফতের সাথে খুবই নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক রাখতেন। বাজামা'ত নামায আদায়কারী, নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায়কারী, নিয়মিত চাঁদাদাতা (ছিলেন এবং) নিজের পরিবারের জন্য পশ্চাতে এক উত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। সার্বিকভাবে তিনি যে জামা'তের জন্য প্রাণ, সম্পদ এবং সময়ের কুরবানী করেছেন তা ছিল অসাধারণ। তিনি বুরকিনা ফাসোর স্থানীয় ৪/৫টি ভাষায় কথা বলতে পারতেন। এর ফলে পুরো দেশের জামা'তগুলোতেই তাঁর বন্ধু-বান্ধব ছিল। ভাষা জানার কারণে জলসা সালানায় অন্যান্য প্রদেশ থেকে আসা লোকদের সাথে একদম মিশে যেতেন। লোকেরা তাঁকে খুব পছন্দ করতো, তাঁর বৈঠকে বসে সবাই আনন্দ অনুভব করতো। জামা'তের পক্ষ থেকে যখনই কোনো তাহরীক করা হতো তাতে তিনিই সর্বাগ্রে অংশগ্রহণ করতেন। বিগত বছর জামা'তের পক্ষ থেকে ওয়াক্‌ফে আরযী করার তাহরীক হয়। তখন মেহদিয়াবাদ জামা'ত থেকে তিনি সর্বপ্রথম নাম লেখান। মেহদিয়াবাদের এই মর্মান্তিক ঘটনায় তাঁর যমজ ভাই জনাব **হুসাইন আগ মালিয়েল** সাহেবও শাহাদত বরণ করেন।

হুসাইন আগ মালিয়েল সাহেব যিনি তাঁর (তথা **আল হাসান আগ মালিয়েল** সাহেবের) যমজ ভাই। যেমনটি বলা হয়েছে যে, যমজ ভাই; (তাই) তাঁর বয়সও ৭১ বছর ছিল। তিনিও ১৯৯৯ সালে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এভাবে তিনিও নিজ গ্রামের প্রারম্ভিক আহমদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আলহাজ্ব ইব্রাহীম সাহেবের সাথে ডোরি মিশন হাউজে গিয়ে অনুসন্ধানকারী দলে তিনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। বর্তমানে তিনি মেহদিয়াবাদে আনসারুল্লাহ্‌র যয়ীম হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য পাচ্ছিলেন। আনসার ভাইদের তিনি উত্তমরূপে সুসংগঠিত করার যোগ্যতা রাখতেন। তাদেরকে জামা'তের বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং কাজে সক্রিয় রাখতেন আর তরবীয়তের জন্য বিভিন্ন প্রোগ্রামের আয়োজন করাতেন। মসজিদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং অন্যান্য জায়গায় ওয়াকারে আমল বা স্বেচ্ছাশ্রম করাতেন। বিভিন্ন চাঁদা নিয়মিত প্রদান এবং পাঁচ বেলার নামায মসজিদে গিয়ে পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন। এছাড়া নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন। মেহদিয়াবাদের মর্মান্তিক ঘটনায় তাঁর যমজ ভাইও শহীদ হয়েছেন; পূর্বেও এর উল্লেখ হয়েছে। একই দিন পৃথিবীতে এসেছিলেন আর একই দিনে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

হামিদু আগ আব্দুর রহমান সাহেব, (মৃত্যুকালে) তাঁর বয়স ছিল ৬৭ বছর। পেশায় তিনিও একজন কৃষক ছিলেন। তিনিও ১৯৯৯ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। অত্যন্ত পরিষ্কার হৃদয়ের অধিকারী এবং সহিষ্ণু মানুষ ছিলেন। সর্বদা জামা'তী অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে থাকতেন। কোনো অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত থাকলে মনে করা হতো যে, হয় একান্ত অপারগতা

রয়েছে নয়তো তিনি অসুস্থ আছেন, অন্যথায় তিনি অনুপস্থিত থাকতেন না। তিনি ছিলেন ইমাম ইব্রাহীম সাহেবের সাহায্যকারীদের অন্যতম। নিজের পরিবারকেও জামা'তের নিযাম তথা ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত থাকার জন্য এবং জামা'তী অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ করতে সর্বদা উপদেশ প্রদান করতেন। খিলাফতে আহমদীয়ার সাথে একান্ত বিশ্বস্ততাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। দীর্ঘ সময় মসজিদে কাটাতেন, এমটিএ'তে অনুষ্ঠান দেখতেন। বিশেষত খুতবা রীতিমতো এবং গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতেন।

সুলেহ্ আগ ইব্রাহীম, শাহাদতকালে তাঁর বয়স ছিল ৬৭ বছর। পেশায় তিনিও একজন কৃষক ছিলেন। বাজামা'ত নামাযের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিয়মিত ছিলেন এবং রীতিমতো চাঁদা দিতেন। মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন এবং জামা'তের একজন একনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন। ইব্রাহীম সাহেবের ডান হাত ছিলেন এবং সাহায্যকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জ্ঞানী মানুষ ছিলেন আর ধর্মীয় কিংবা জ্ঞানগর্ভ আলাপ-আলোচনা করা তাঁর অভ্যাস ছিল। জামা'তের আনসারদের মাঝে যখনই জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হতো তখন তাঁকে এমন আসরে পাওয়া যেত। অত্যন্ত সহিষ্ণু ও ভদ্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ছোটো–বড়ো নির্বিশেষে সবার সাথে সদ্ব্যবহার করা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। সালানা জলসা কিংবা ইজতেমায় যাওয়ার সময় যদি তিনি লক্ষ্য করতেন যে, কারো কাছে যাতায়াতের ভাড়া নেই অথবা পর্যাপ্ত অর্থ নেই, সেক্ষেত্রে তিনি নিজের পক্ষ থেকে তাকে সাহায্য সহযোগিতা করতেন যেন সে-ও অংশগ্রহণ করতে পারে। সম্প্রতি, অর্থাৎ এ বছর ডোরি এলাকা থেকে বেরিয়ে সফর করা অত্যন্ত সাহসিকতার কাজ ছিল, কেননা সন্ত্রাসীরা সর্বত্র ত্রাস সৃষ্টি করে রেখেছিল, কিন্তু বিরাজমান শত বিপদসংকুল পরিবেশ সত্ত্বেও মেহদিয়াবাদ থেকে সফর করে বুরকিনা ফাসোতে গিয়ে ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে অনুষ্ঠিত বার্ষিক জলসায় অংশগ্রহণ করেন।

পরের জন হলেন, **উসমান আগ সুদে সাহেব।** (শাহাদতের সময়) তাঁর বয়স ছিল ৬৯ বছর। নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ আহমদী ছিলেন। জামা'তের জন্য অর্থ ও সময় উৎসর্গকারী ছিলেন এবং পরিশেষে আল্লাহ্ তা'লা প্রাণ বিসর্জনেরও তৌফিক দান করেছেন। মেহদিয়াবাদের মসজিদ নির্মাণকালে পানি বহন করে নিয়ে আসতেন আর নির্মাণকাজে নিরবচ্ছিন্নভাবে সহযোগিতা করেন এবং অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। নিয়মিত নামায পড়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। রীতিমত চাঁদা দিতেন। যা-ই আয় করতেন তা থেকে সর্বপ্রথম চাঁদার অর্থ প্রদান করতেন। এমন মানসিকতার মানুষ কি অর্থের লোভে বয়আত করে যেমনটি বিরোধীরা বলেছে? পেশায় তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। জুতার ব্যবসা করতেন। কারো জুতা কেনার সামর্থ্য না থাকলে অথবা পর্যাপ্ত অর্থ না থাকলেও তাকে শূন্য হাতে যেতে দিতেন না। কাউকে খালি পায়ে ফিরিয়ে দিতেন না। কারো কাছে অর্থ না থাকলে অথবা পর্যাপ্ত অর্থ না থাকলে তিনি বলতেন, কোনো সমস্যা নেই, পরে দিলেও চলবে।

আরেকজন হলেন, **আগ আলী আগ মাগোয়েল সাহেব**। তিনি ১৯৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতার সাথে ১৯৯৯ সালে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। পেশায় তিনি একজন কৃষক ছিলেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বিলারের (Belare) মুয়ায্যিন ছিলেন। সন্ত্রাসবাদের কারণে কিছুদিন পূর্বে তাকে নিজের গ্রাম থেকে বসতবাড়ি স্থানান্তর করতে হলে তিনি মেহদিয়াবাদে এসে বসতি স্থাপন করেন। খুবই নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। বিভিন্ন নামায এবং চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি নিয়মিত ছিলেন। এছাড়া জামা'তের সকল কর্মকাণ্ডে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করতেন।

পরের জন হলেন, **মূসা আগ ইদরাহী সাহেব**। শাহাদতের সময় তার বয়স ছিল ৫৩ বছর। তিনিও কৃষিকাজ করতেন। জামা'তের বিভিন্ন কাজে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। আহমদী হওয়ার পূর্বে তিনি ওয়াহাবী ফির্কার অত্যন্ত সক্রিয় সদস্য ছিলেন। (ফরয) নামাযগুলোতে তিনি খুবই নিয়মিত ছিলেন এবং তাহাজ্জুদ নামাযও রীতিমতো পড়তেন। মাগরিবের নামাযের জন্য মসজিদে

এসে এশার নামায পড়েই বাড়ি ফিরতেন। মাগরিব ও এশার সময় মসজিদে অবস্থান করতেন এবং যিক্‌রে এলাহীতে মগ্ন থাকতেন। তার সম্পর্কে সবাই এ সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি একজন সত্যিকার মু'মিন এবং একনিষ্ঠ ও নিবেদিতপ্রাণ আহমদী হওয়ার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত ছিলেন। আমার কাছে তিনি নিয়মিত দোয়া চেয়ে চিঠি লিখতেন আর বলতেন, আমিও যুগ-খলীফার জন্য নিয়মিত দোয়া করে থাকি।

নবম জন হলেন, **আগ উমর আগ আব্দুর রহমান সাহেব**। শাহাদতের সময় তার বয়স ছিল ৪৪ বছর। তিনি সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৯৯ সনে ২০ বছর বয়সে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। এরপর জামা'তের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে উন্নতি করতে থাকেন। মেহদিয়াবাদ জামা'তের খুবই নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ একজন সদস্য ছিলেন। ইমাম ইব্রাহীম সাহেবের ডান হাত ছিলেন। **মেহদিয়াবাদ (মসজিদ)-এর নায়েব ইমামও ছিলেন।** মসজিদে প্রবেশের পর সন্ত্রাসীরা ইমাম ইব্রাহীম সাহেবকে জিজ্ঞাসাবাদের পর জিজ্ঞেস করে, নায়েব ইমাম কে? তখন তিনি নির্দ্বিধায় বলেন, আমি (নায়েব ইমাম)। যেসব মানুষ মসজিদে প্রথম আসে সর্বদা তিনি তাদের একজন হতেন। তিনি খুবই ধীরেসুস্থে ও আন্তরিকতার সাথে নামায পড়তেন। তাহাজ্জুদ নামাযেও অভ্যস্ত ছিলেন। ছেলেমেয়েকেও নিজের সাথে মসজিদে নিয়ে আসতেন এবং তাদের তরবীয়তের বিষয়ে খুবই যত্নবান ছিলেন। তিনিও আমার কাছে নিয়মিত পত্র লিখতেন। সাইকেল চালনায় খুব দক্ষ ছিলেন আর গোটা অঞ্চলে দীর্ঘ পথ (সাইকেলে) সফর করতেন। ডোরি থেকে তিনি চারবার ২৬৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে ওয়াগাডুগুতে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমায় অংশগ্রহণ করেন। ২০০৮ সনে খিলাফত জুবলীর জলসা উপলক্ষ্যে বুরকিনা ফাসো থেকে যে কাফেলা সাইকেল চালিয়ে ঘানা গিয়েছিল তাতে তিনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

প্রত্যেক নামের সাথে যে **'আগ'** শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তাতে তাদের রিপোর্ট থেকে আমি যা বুঝেছি তা হলো– এর অর্থ **ইবন, অর্থাৎ অমুকের পুত্র**। আগ অমুক অর্থ অমুক ব্যক্তি তমুকের পুত্র কিংবা ইবনে অমুক। যাহোক, তার সম্পর্কে আরো লিখেছেন, ৮জনকে শহীদ করার পর শেষে আগ উমর আগ আব্দুর রহমান সাহেব রয়ে যান। বয়সের দিক থেকে তিনি (তাদের মধ্যে) সবচেয়ে ছোট ছিলেন। সন্ত্রাসীরা তাকে বলে, তুমি যুবক মানুষ, তুমি (চাইলে) আহমদীয়াত অস্বীকার করে নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারো। কিন্তু অত্যন্ত সাহসিকার সাথে তিনি তাদের বলেন, **আমার বয়োজ্যেষ্ঠরা যে পথ ধরে জীবন উৎসর্গ করেছেন আমিও আমার ইমাম এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ঈমানের খাতিরে নিজের জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত আছি। একথা শুনে তাকে অত্যন্ত নির্মমভাবে মুখমণ্ডলে গুলি করে শহীদ করা হয়।**

বুরকিনা ফাসোতে সার্বিকভাবেই পরিস্থিতি খারাপ। সন্ত্রাসীরা অনেক অঞ্চলেই তাণ্ডব চালিয়ে থাকে। কিছুদিন পূর্বে দ্বীনিয়া (Denea) মজলিসের কায়েদ সাহেব কেন্দ্র তথা মিশন হাউজে এসে বলেন, গ্রামে আমার মুদির দোকান রয়েছে। একদিন সন্ত্রাসীদের একজন তার দোকানে আসে। (এটি পুরোপুরি ভিন্ন একটি অঞ্চল;) আর সে কিছু ক্রয় করতে আসে। সে এদিক সেদিক দেখছিল। সেখানে তার দোকানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং খলীফাদের ছবি ঝোলানো ছিল। সে কায়েদ সাহেবকে জিজ্ঞেস করে, এরা কারা? দোকানে তুমি কাদের ছবি ঝুলিয়ে রেখেছ? তখন কায়েদ সাহেব উত্তর দেন, এগুলো মসীহ্ মওউদ এবং তাঁর খলীফাদের ছবি। সে বলে, মসীহ্ মওউদ না, বরং মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোক একজোট হয়ে একটি দল বানিয়েছে, এরাই সেসব লোক আর এরা কাফির। যাবার আগে কায়েদ সাহেবকে হুমকি দিয়ে বলে, এসব ছবি এখান থেকে নামিয়ে ফেলো, নতুবা পরের বার আমি যখন আসব তখন যদি এগুলো এখানে থাকে তাহলে তোমার অবস্থা খুব খারাপ হবে। কিন্তু কায়েদ সাহেব সেসব ছবি সেখানেই ঝুলে থাকতে দেন। কিছুদিন পর সে আবার কিছু কিনতে এসে দেখে, ছবিগুলো সেখানেই ঝোলানো রয়েছে। (এটি) দেখে সে চলে যায়। তিনি বলেন, কায়েদ

সাহেব আমাদেরকে এ ঘটনা শোনানোর পর আরো ছবি দিতে বলেন। ভয় পাবার বদলে তিনি বলেন, এখন আমি আরো বিভিন্ন স্থানে এসব ছবি ঝোলাবো। এই পুরো অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরে এসব জঙ্গীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে অথচ সেখানে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই। এই অঞ্চলটির একদিকের সীমান্ত মালী সংলগ্ন আর অপরদিকে ডোরি অঞ্চলটি নাইজারের সীমান্ত সংলগ্ন; এভাবে এই পুরো অঞ্চলটিই বলতে গেলে তাদের কব্জায় রয়েছে।

যাহোক, **এঁরা আহমদীয়াতের উজ্জ্বল নক্ষত্র, নিজেদের পেছনে এক দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সন্তানসন্ততি এবং বংশধরদেরও নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় সমৃদ্ধ করুন। শত্রু মনে করে, এঁদেরকে শহীদ করার মাধ্যমে এই অঞ্চল থেকে আহমদীয়াতকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কিন্তু ইনশাআল্লাহ্, এখানে আহমদীয়াত আগের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং বিস্তৃতি লাভ করবে।** সেখানকার ব্যবস্থাপনা এবং আমীর সাহেবেরও প্রজ্ঞার সাথে তবলীগের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত, সেখানে গিয়ে তাদেরকে সাহসও যোগানো উচিত। আল্লাহ্ তা'লা তাদের আত্মীয়স্বজনকে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল দান করুন এবং তাদের বয়োজ্যেষ্ঠরা যে মহান উদ্দেশ্যে নিজেদের প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন তার গুরুত্ব বোঝার সামর্থ্যও তাদের দান করুন। যাহোক, **এখন সেখানে এক প্রজ্ঞা ও পরিকল্পনার অধীনে আমাদের কাজ করতে হবে।** এ প্রসঙ্গে আমি আগেও তাদের বলেছি, সেখানে যান এবং স্থানীয় লোকদের সমন্বয়ে প্রজ্ঞার সাথে বস্তুনিষ্ঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।

শহীদদের পরিবারের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে, তাদেরকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোর জন্য চতুর্থ খলীফার যুগ থেকেই **সৈয়্যদনা বেলাল ফান্ড** নামে একটি ফান্ড প্রতিষ্ঠিত আছে, যা থেকে শহীদদের জন্য ব্যয় করা হয়ে থাকে। বর্তমানে এই ঘটনার পর কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবেও এবং বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন এবং জামা'তও তাদের চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে কিছু অর্থ পাঠাচ্ছেন যে, এ অর্থ তাদের জন্য। অথচ একটি ফান্ড যেহেতু ইতঃমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে, তাই সবার উচিত তারা যে অর্থই দিতে চায় তা সৈয়্যদনা বেলাল ফান্ডে যেন জমা দেয়ার পর জানিয়ে দেয়, আমরা এই অর্থ জমা দিয়েছি এবং আমাদের ইচ্ছা হলো তা যেন বিশেষভাবে ডোরির মেহদিয়াবাদের শহীদদের জন্য ব্যয় করা হয়। তাহলে কেন্দ্র অবশ্যই সে অনুসারে সিদ্ধান্ত নেবে। **কোনো অর্থ আসুক বা না আসুক, কেন্দ্র তো তাদের চাহিদার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে এবং (তা) পূরণ করবেই, ইনশাআল্লাহ্**। কিন্তু যারা দিতে চান তারা এই ফান্ডে, অর্থাৎ সৈয়্যদনা বেলাল ফান্ডে অর্থ জমা দিন। **এটি এসব শহীদের পরিবারের প্রতি কোনোরূপ অনুগ্রহ নয়, বরং তাদের প্রয়োজনের প্রতি খেয়াল রাখা এবং তা পূরণ করা আমাদের আবশ্যিক দায়িত্ব।**

সবশেষে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি। তিনি (আ.) বলেন,

"এটি মনে কোরো না যে, খোদা তোমাদের বিনষ্ট করবেন। তোমরা খোদার হাতের এক বীজ বিশেষ যা মাটিতে বপন করা হয়েছে। খোদা বলেছেন, এই বীজ উদ্গত হবে, ফুল দেবে এবং চতুর্দিকে এর ডালপালা বিস্তৃতি লাভ করবে আর এক মহা মহিরুহে পরিণত হবে, (ইনশাআল্লাহ্)। অতএব সৌভাগ্যবান তারা যারা খোদার কথায় ঈমান রাখে এবং অন্তর্বর্তীকালীন বিপদাপদে ভীত হয় না, কারণ বিপদাপদ আপতিত হওয়াও আবশ্যক যেন খোদা তোমাদের পরীক্ষা করেন।" (আল্ ওসীয়্যত পুস্তিকা, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃঃ ৩০৯)

অতএব এসব কুরবানী প্রদানকারী তো এই পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন, এখন তাদের জন্যও নিজ নিজ ঈমান ও একীনে উন্নতি করার পরীক্ষা যারা পেছনে রয়ে গেছেন। **আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এবং আমাদেরকেও পূর্ণাঙ্গীন ঈমান ও একীনে অটল থাকার সামর্থ্য দিন। এসব শহীদের মর্যাদা আল্লাহ্ তা'লা উত্তরোত্তর উন্নীত করুন। তাদের এসব আত্মত্যাগকে তিনি ফুলেফলে সুশোভিত করুন যার ফলে হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রকৃত শিক্ষাকে আমরা পৃথিবীর বুকে**

দ্রুততম সময়ে বিস্তার লাভ করতে দেখতে পাই। এছাড়া পৃথিবী থেকে অজ্ঞতা দূরীভূত হোক এবং এক-অদ্বিতীয় খোদার প্রকৃত রাজত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হোক।

নামাযের পর এসব শহীদের জানাযার সাথে আমি আরো দু'জন নিষ্ঠাবান আহমদীর জানাযাও পড়াব। তাদের একজন হলেন, **ডক্টর করীমুল্লাহ্ যিরভী সাহেব**, তিনি সূফী খোদা বখ্শ যিরভী সাহেবের পুত্র ছিলেন এবং (বর্তমানে) আমেরিকা নিবাসী ছিলেন। গত ৪ঠা জানুয়ারি তিনি ৮৩ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। তার পিতা সূফী খোদাবখ্শ সাহেব ১৭ বছর বয়সে ১৯২৮ সনে কাদিয়ানে গিয়ে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র হাতে বয়আত করেছিলেন। করীমুল্লাহ্ যিরভী সাহেব হযরত মালেক সাইফুর রহমান সাহেবের জামাতাও ছিলেন। অনেক জ্ঞানী একজন মানুষ ছিলেন, কয়েকটি পুস্তকও তিনি রচনা করেছেন। জামা'তের অনেক সেবা করারও তিনি সৌভাগ্য লাভ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো, যিরভী সাহেবের সহধর্মিনী **আমাতুল লতীফ যিরভী সাহেবার**। তিনি করীমুল্লাহ্ যিরভী সাহেবে স্ত্রী ছিলেন, আমেরিকায় বসবাস করতেন আর তিনি মালেক সাইফুর রহমান সাহেবের মেয়ে ছিলেন। তিনি ৬ জানুয়ারি তার স্বামীর মৃত্যুর দু'দিন পরই ৭৮ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। মরহুমা ওসীয়্যতকারী ছিলেন। যেমনটি আমি পূর্বেই বলেছি, তিনি মালেক সাইফুর রহমান সাহেবের মেয়ে ছিলেন। তার মাতার নাম ছিল রশীদ শওকত যিনি রাবওয়া থেকে প্রকাশিত মিসবাহ্ পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। তার জন্ম হয়েছিল কাদিয়ানে। খুবই জ্ঞানপিপাসু একজন মহিলা ছিলেন। শিক্ষিতা ছিলেন, এমএসসি পাশ করেছিলেন। জামা'তের সেবা করার সৌভাগ্যও তিনি লাভ করেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথেও ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

তার ভাই মালেক মুজীবুর রহমান সাহেব তার বোন এবং ভগ্নিপতি সম্পর্কে লিখেন, এই দম্পতির মাঝে গভীর ভালোবাসা ছিল। তারা অনেক কষ্ট সহ্য করা সত্ত্বেও কখনো কোনো বিষয়ে অভিযোগ করেন নি। কখনোই আমি তাদেরকে অন্য কারো সম্পর্কে কোনো নেতিবাচক মন্তব্য করতে শুনি নি। তারা উভয়ই জ্ঞানের এক গভীর সমুদ্র ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রত্যেকের সাথে তাদের ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল; তাদের প্রয়োজন ও চাহিদার প্রতি তারা দৃষ্টি রাখতেন আর ভীষণ আদর ও স্নেহ করতেন। মাশাআল্লাহ্ তারা খুবই পূর্ণাঙ্গীন ও সুন্দর জীবনযাপন করেছেন। নিজেদের সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতার ওপর তারা অত্যন্ত ইতিবাচক প্রভাব রাখতেন এবং তারা উত্তম প্রভাব বিস্তারকারী পুণ্যবান মানুষ ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে ক্ষমা ও দয়াসুলভ আচরণ করুন।

(সূত্রঃ আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩, পৃঃ ৫-১১)